21 JAN 2017
যুগান্তর

বিমল সরকার

পাবলিক পরীক্ষার পালাবদল

কেবল পাবলিক পরীক্ষা নয়, যে কোনো পরীক্ষা নিয়েই আমাদের দেশে আলোচনা-সমালোচনা এবং ভাবনা-দুর্ভাবনার অন্ত নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়— স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছর পরও আমরা এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। একটি সময় পরীক্ষার হলে নকল ছিল মূল সমস্যা। এখন নকলের মাত্রা কমে এলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস ও খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়াসহ আরও নানা রকমের রাহু এসে ভর করেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। বেশ বড় দাগে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শিক্ষার মান নিয়ে।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। গোটা জাতি তখন একদিকে স্বজন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান, অন্যদিকে সর্বোচ্চ প্রাপ্তির আনন্দে উদ্বেলিত। এমনই এক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশে ফিরে নতুন সরকার গঠন করেন। নবগঠিত সরকার সদ্যসমাপ্ত যুদ্ধ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের 'অটো-প্রমোশন' দেয়ার ব্যবস্থা করে। এ ব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা যে শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিল তাদের কোনোরকম পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াই পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় সব শিক্ষার্থীই সে সময় অটো-প্রমোশনের সুযোগ গ্রহণ করে। এসএসসি, এইচএসসি বা ডিগ্রির (পাস ও সাবসিডিয়ারি) মতো পাবলিক পরীক্ষায় কিন্তু এই নিয়ম প্রয়োগ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি ফরম পূরণ ও ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণের আয়োজন করা হয়। ১৯৭২ সালে এসব পাবলিক পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক, বলা যায় রেকর্ড পরিমাণ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। কেউ নিয়মিত, কেউবা অনিয়মিত।

এটা সত্য এবং বলার আর অপেক্ষা রাখে না, এই বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর কারোরই তখন নিয়মমাফিক ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দেয়ার মতো প্রস্তুতি ছিল না। যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সোজা পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেছেন। লেখাপড়া করার কোনো রকম সময় ও সুযোগ পাওয়ার প্রশ্নই আসে না তাদের। যারা প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছিলেন তাদের বেলায়ও একই কথা। আর যারা অনন্যোপায় হয়ে জীবন বাজি রেখে দেশের ভেতরেই রয়ে গেলেন তারা তো প্রকৃতপক্ষে ছিলেন হিংস্র কুমিরের মুখে। সীমাহীন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর চরম অনিশ্চয়তা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে আজ এখানে তো কাল সেখানে। এ রকমই ছিল নয় মাসের যুদ্ধ এবং উদ্বাস্তু-জীবন। বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর লেখাপড়া ছাড়া পরীক্ষার হলে বসার ফল যা হওয়ার তা-ই হল। গণহারে, ফ্রি স্টাইলে নকল হল দেশের সব পরীক্ষা কেন্দ্রে। পাবলিক পরীক্ষায় এত অনিয়ম ও বিশৃংখলা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি আমাদের দেশে। বাইরে থেকে সম্পূর্ণ উত্তরপত্র লিখে আনা, পরীক্ষার্থীর আসনের পাশে বসে অন্য কেউ খাতায় লিখে দেয়া, পরীক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় বেশিসংখ্যক 'দর্শনার্থী' বা 'সাহায্যকারী'র কক্ষের ভেতরে অবস্থান, কক্ষের ভেতরে বসেই টিফিন খাওয়া, ব্যাপক হৈ চৈ এবং হাসি-তামাশা, কর্তব্যরত পরিদর্শককেই বই থেকে প্রাসঙ্গিক নির্দিষ্ট উত্তর বের করে দেয়ার তাগিদসহ হেন কিছু বাদ নেই যা এ সময় করা হয়নি। পরীক্ষার্থীদের মাঝে উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা এবং স্বাক্ষর করে তা সময়ে, এমনকি কখনও কখনও অসময়েও গ্রহণ করা ছাড়া পরীক্ষা-কক্ষের ভেতর শিক্ষকদের আর কোনো কাজ করার সুযোগ ছিল না। এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে তখনকার বহুল প্রচারিত দৈনিক আজাদ প্রথম পৃষ্ঠায় খবরের শিরোনাম করে 'এক্সামিনেশন না এক্সিবিশন'! সারা দেশের চিত্রই ছিল প্রায় একইরকম। কোথাও বড় ধরনের কোনো গোলযোগ না হওয়ার আসল কারণ ছিল, সে সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের পক্ষ থেকে বাস্তবতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। তাই অবাধ নকল প্রতিরোধে ধনুকভাঙা পণ নিয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা বইয়ের টেবিলে বসার সময় ও সুযোগ পায়নি। অন্যদিকে বিরাজমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষেরও হাজার

হাজার পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করার মতো কোনো প্রস্তুতি ছিল না। এ বিবেচনায় সে সময়কার গণটোকাটুকির বিষয়টি একরকম অনিবার্য হয়ে ওঠে। এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি এবং এসবের সমমান সব পরীক্ষারই বলতে গেলে একইরকম হাল হয়। এমনভাবে যারাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, তারাই বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছিল।

১৯৭২ সালের মতো ১৯৭৩ সালেও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭৩ সালে সব পরীক্ষাতেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল আরও বেশি, বলা যায় রেকর্ডসংখ্যক। আগের বছরের মতোই ফ্রি স্টাইলে নকল হবে এবং অতি সহজেই 'পরীক্ষা-বৈতরণী' পার হওয়া যাবে এমন আশা নিয়ে ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন হাজার হাজার ব্যক্তি তখন রাতারাতি পরীক্ষার্থী বনে গেলেন! গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রী, বড় অফিসের পিয়ন, ছোট অফিসের সাহেব, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ শিক্ষক, বিএডিসির ক্যাশিয়ার-মেকানিক, সাধারণ ব্যবসায়ী-দোকানদার— মোটকথা খুব কম লোকই বাকি ছিলেন যারা সুযোগ বুঝে এ সময় যার যার উচ্চতর ডিগ্রিটি করায়ত্ত করার প্রাণান্ত চেষ্টা করেননি বা এ ক্ষেত্রে সফল হননি। গুণীজনরা বলেন, 'বিদ্যা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। এ কথাটিই একটু পাল্টিয়ে তারা প্রমাণ করলেন— ডিগ্রি লাভের জন্য কোনো বয়স লাগে না। তাদের মধ্যে বিপুলসংখ্যকই ছিলেন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, এমনকি ৭০-৮০ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও দেখা গেছে যথারীতি ফরম পূরণ করে নিঃসংকোচে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পাশে বসে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে। বারবার বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে কিংবা একাধিকবার নির্বাচনী (টেস্ট) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ব্যর্থ হওয়ার পর জীবনে যারা লেখাপড়া বা ডিগ্রি লাভের আশা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিলেন সেসব 'আদু ভাই'রাও কেউ নিজের ছেলের সঙ্গে, কেউ ছেলের বৌ-এর সঙ্গে, এমনকি কেউ কেউ নাতি-নাতনির সঙ্গে বসেও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া অফিসের বসের সঙ্গে কিংবা অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে একই বেঞ্চে বসে পরীক্ষা দেয়ারও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এমন অবস্থায় ফল যা হওয়ার তা-ই হল। সরকারের পক্ষ থেকে কিছুটা চেক দেয়ার চেষ্টা করা হলেও '৭৩ সালেও বলতে গেলে '৭২ সালের মতো বেশ ব্যাপক হারেই নকল হল।

পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একটি অপবাদ এ জাতিকে দীর্ঘদিন বয়ে বেড়াতে হয়। অনেকটা তাচ্ছিল্য বা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয় '৭২ সালের কোনো পরীক্ষায় পাস করা ব্যক্তিকে। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সত্তরের দশক, এমনকি আশির দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্তও 'বাহাত্তরের স্টাইল' কথাটি বেশ প্রচলিত ছিল। পরে অবশ্য পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত নানা অপকীর্তি বাহাত্তরের স্টাইলকেও ম্লান করে দেয়। এ ক্ষেত্রে '৭২, '৮৫, '৯৫ কিংবা '৯৮ সালকে খুব একটা আলাদা করা যাবে না।

১৯৭৪ সালে পাবলিক পরীক্ষার বেলায় দেখা গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। মানুষের মনে যুদ্ধ-পরবর্তী দিনের আবেগ-বিহ্বলতা আর আগের মতো ছিল না। বঙ্গবন্ধু সরকার দেশ পুনর্গঠনের কাজে পুরোপুরি মগ্ন। চারদিকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাচালান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সীমাহীন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সরকার হয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং এ ব্যাপারে সরকার বেশ সফলতাও অর্জন করে। পরীক্ষার হলে হৈচৈ কিংবা নকল করা তো দূরের কথা, কোনো পরীক্ষার্থী টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করার সুযোগ পায়নি। পরীক্ষা কেন্দ্রে সবার জন্যই স্বস্তিদায়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। প্রায় সারা দেশেই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দু-একটি বিচ্ছিন্ন বা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেনি তা নয়। কিন্তু সেগুলো ছিল একেবারেই নগণ্য। ফলে দেখা যায় এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় '৭২ বা '৭৩ সালে যেখানে পাসের হার ছিল ৯৮, ৯৫ বা ৮০-৮৫ শতাংশ, সেখানে ১৯৭৪ সালে তা মাত্র ৩৫ শতাংশে বা তারও নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫ সালের অবস্থাও ছিল অনেকটা এমনই গোলযোগহীন। নকল নেই, হট্টগোল নেই, ব্যাপক হারে বহিষ্কার নেই, গণহারে পাসও নেই।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আমলে পাবলিক পরীক্ষাগুলো কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়া আমার লক্ষ্য নয়। সেটি করা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি কেবল বলতে চাচ্ছি, একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে '৭২ ও '৭৩ সালে ব্যাপক গণটোকাটুকির পর মাত্র অল্পদিনের ব্যবধানে কীভাবে তৎকালীন সরকার পরীক্ষা গ্রহণে তথা শিক্ষা ক্ষেত্রে মোটামুটি সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আশাতীত সফলতা অর্জন করেছিল। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের পরীক্ষাগুলোতে নকলের বিষয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন, এর দায় কিন্তু সরকারের ওপরই বর্তায়। কিন্তু কী আশ্চর্য; একই সরকার '৭৪ ও '৭৫ সালে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করে পূর্ববর্তী দু'বছরের ব্যর্থতার গ্লানি মোচন তো বটেই, উপরন্তু দেশে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তও স্থাপন করল।

আশির দশক থেকে লক্ষ্য করা যায় শিক্ষা বা পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন খেলা। পরীক্ষার্থী, নকল, বহিষ্কার ও ফেল করা শিক্ষার্থী সবকিছুরই সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়তে থাকে। এসএসসি বা এইচএসসিতে একটিমাত্র পরীক্ষায় ৫০-৬০ হাজার শিক্ষার্থী বহিষ্কার হয়! প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ায় পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষাদানে বিরত থাকে! জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুষ্ঠিত ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার প্রথম দিনেই পাঁচ হাজার বহিষ্কার হয়! এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় আট লাখ, পাস করে মাত্র দেড় লাখ; সাড়ে ছয় লাখই ফেল!

এর সবকিছুকে নিছক গালগল্প বলে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। অস্বীকার করা যাবে না, বিগত বছরগুলোতে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছি। অনেক অবাঞ্ছিত ও বিব্রতকর পরিস্থিতি অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। তবে বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া ও উপবৃত্তি প্রদানের মতো কর্মকাণ্ডের বাইরে আরও অনেক কাজ এখনও বাকি রয়েছে। সেগুলো সম্পন্ন করতে পারলেই জাতির জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিমল সরকার : *সহকারী অধ্যাপক*
bimalsarker59@gmail.com